বাংলায় ব্যারন

অনুবাদ: তমোঘ্ন নষ্কর

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ 'রূপদর্শী' ছদ্মনামে লিখতে গিয়ে 'ব্রজদা' নামে এক সর্ববিদ্যাবিশারদ ও সর্বকর্মপটু চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রজদা'র রোমহর্ষক কীর্তিকাহিনি 'গুল্প' নামে পরিচিত ছিল। বুঝতেই পারছেন, গুল + গল্পের এই ককটেল তিনি একা পরিবেশন করেননি। বাংলাতেই টেনিদা, ঘনাদা, পিন্ডিদা থেকে আমাদের প্রজন্মে অনীশ দেবের সৃষ্ট বিশ্বমামা— এই পথে আমরা পিছোতে পারি একেবারে কমলাকান্ত অবধি। রীতিমতো সম্ভ্রমোৎপাদক এই তালিকায় যাঁর নাম একেবারে স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করবে তিনি হলেন ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধর। কেন বলুন তো? কারণ, 'কুম্ভীর বিভ্রাট' পড়ে আমরা সেই অপাপবিদ্ধ অবস্থাতেই বুঝে ফেলেছিলাম, কুমিরের খাদ্য হওয়া মানুষও সর্বাঙ্গে গয়না পরে কুমিরের পেটের মধ্যে বসে বেগুন বেচতে পারে! তার চেয়েও বড়ো কথা, গল্পের আসল ম্যাজিক যে "কাহাকে সে বেগুণ বেচিতেছিল?" প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বরং ডিগনিফায়েড একজিট নেওয়াতেই, এটা ডমরুধরই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই ধরনের গুল্পকে সাহিত্যে 'টল টেলস' বলা হয়ে থাকে।

Narrative that depicts the wild adventures of extravagantly exaggerated folk heroes— এভাবেই 'টল টেলস'-এর সংজ্ঞা দিয়েছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে অক্লেশে নদী বা হ্রদ খুঁড়ে ফেলা দৈত্যাকৃতি লাম্বারজ্যাক পল বুনিয়ান, কাউবয় উইলিয়াম এফ কোডি, ঝড়ে পানামার ওপর দিয়ে ঠিকরে যাওয়ার সময় পানামা খাল খুঁড়ে

ফেলা ক্যাপ্টেন স্টর্ম্যালং— এমনই নানা চরিত্র। এঁদের বাইরেও আছেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের 'ব্রিগেডিয়ার জেরার্ড', আর্নেস্ট ব্রামার 'কাই লুং', মাইক রেসনিকের 'রেভারেন্ড লুসিফার জোনস'। কিন্তু এঁদের সবার পূর্বসূরি হিসেবে যাঁর নাম ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে, তিনি হলেন ব্যারন মিউনখহাউজেন বা মুনশাউজেন।

এই চরিত্রটি কাল্পনিক, কিন্তু এঁকে গড়া হয়েছিল সত্যিকারের ব্যারন, হায়রোনিমাস কার্ল ফ্রেডেরিখ ভন ফ্রিহার মিউনখহাউজেন-এর আদলে। রাশিয়া আর অটোমান তুরস্কের মধ্যে ১৭৩৫ থেকে ১৭৩৯ অবধি চলা যুদ্ধে এই ব্যারন রাশিয়ার হয়ে লড়েছিলেন। ১৭৬০ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর ভদ্রলোক যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর নানা অবিশ্বাস্য কীর্তিকলাপ গল্পের মতো করে শোনাতেন লোকেদের। অভিজাত মহলে মনোরঞ্জক হিসেবে তাঁর বেশ নাম ("নাম কিউঁ, বদনাম বোলিয়ে"— সৌজন্যে মগনলাল মেঘরাজ) হয়। হয়তো এই দেখেশুনে খেপে গিয়েই রুডলফ এরিখ রাস্প তৈরি করেন ওই নামেরই এমন এক চরিত্র, যাঁর গুল্পের সামনে সত্যিকারের ব্যারনও ফেল মেরে যাবেন। সেগুলো লেখকের নাম ছাড়াই প্রথমে জার্মান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৭৮৫ সালে ওগুলো ইংরেজিতে অক্সফোর্ড থেকে বই আকারে সংকলিত হয়। দারুণ জনপ্রিয় হওয়ার ফলে নানা ইউরোপীয় ভাষার পাশাপাশি জার্মানেও অনূদিত হয় বইটা। তখন সত্যিকারের ব্যারন জানতে পারেন, কী হইতে কী হইয়া গিয়াছে! বেজায় রেগে তিনি লেখক ও প্রকাশকদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছিলেন। ঝামেলা এড়াতে এই গল্পগুলোর স্রষ্টা নিজেকে এদের লেখক বলে দাবিই করেননি! রাস্পের নাম সর্বসমক্ষে আসে তাঁর মৃত্যুর পর।

বিশ্বসাহিত্যে এই গল্পগুলোর প্রভাব যে কতটা ব্যাপক, তা বলে বোঝানো মুশকিল। এখন মূল বইটা হয়তো কমই পড়া

হয়, কিন্তু মিউনখহাউজেন-এর সন্ততিরা প্রায় সব ভাষার সাহিত্যে দাপটে বিরাজমান। শুধু সাহিত্যে নয়, বিদ্যাচর্চার জগতেও এই নামটি অমর হয়ে আছে মিউনখহাউজেন সিনড্রোম (ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ বাস্তবে না হলেও তা হয়েছে এমন দাবি করার মনোরোগ), মিউনখহাউজেন ট্রাইলেমা (অসম্ভব যুক্তি দিয়ে অবাস্তবকে প্রমাণ করার চেষ্টা), মিউনখহাউজেন নাম্বার ইত্যাদিতে।

এই অমর চরিত্র তথা ঘরানার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন লেখক তাঁর নিজস্ব ভঙ্গির অনুবাদে। সেটি ভালোভাবে উপভোগ করতে চাইলে আগে মোবাইলটাকে দূরে সরিয়ে রাখুন, যাতে গুগল করে "এরকম আবার হয় নাকি?" জানতে চাওয়ার ইচ্ছেটা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখা যায়। তারপর বেশ আরাম করে বসুন। ভাবুন, উলটোদিকে একটা সোফা বা গদিওলা চেয়ারে বসে আছেন ব্যারন নিজে। এবার তিনি মুখ খুলতে চলেছেন। তিন... দুই... এক...!

সূচিপত্র

ফায়ার	১১
অন্ধ শিকার	১৭
নেকড়ের মুখে লাগাম	২৬
পেরেক	৩৩
গাছটা হাঁটছে	৩৬
ভালুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল	৪০
নেকড়েটা মোজার মত উলটে যাচ্ছে	৪৪
অভিজাত ঘরের ঘোড়া	৪৮
আকাশে ওড়ার গল্প	৫২
অর্ধেক ঘোড়া	৫৭
চন্দ্রাভিযান	৬৪
সুরগুলো জমে বরফ!	৭০
চড়া	৭৫
হারিয়ে ফেরা	৮১

রাণীর বাগান	৮৭
চামগুলতি	৯৪
অ্যান্টার্কটিকা অভিযান	১০১
উড়ুক্কু গাছ	১০৪
ঘুম	১১০
সিংহ তা ভাবল কী করে?	১১৩
চাঁদে মানুষদের শৈশব কৈশোর নেই	১১৯
তিমির উদরে দু'বার জোয়ারভাঁটা হত	১২৭
চিঠি	১৩৩

ফায়ার

"কোথায় ছিল ঠিক জলাটা... মানে এখন তো..."

"তোমার বয়স কত বাছা, এখন তো দুধের দাঁত..."

"আরে ছাড়ুন তো ওর কথা, ও সেদিনের ছোকরা জানে কী? আপনি বলুন", পরিস্থিতি সামাল দিতে আমি তড়িঘড়ি বলে উঠলুম।

"হুম..." বলে তুম্বো মুখে গড়গড়ার নলে টান দিতে লাগলেন প্রবৃদ্ধ ব্যারন।

এই ফাঁকে একটু বলে নিই, আমরা মানে ব্রডস্কি, লিস্যাস্কো, বুড়ো শেমল সবাই বসে আছি ব্যারনের আড্ডায়।

এই আড্ডাটা আমাদের নেশায় দাঁড়িয়েছে। নিন্দুকেরা বলে আমরা নাকি ব্যারনের সংগ্রহের দুর্লভ রাইনওয়াইনের স্বাদ নিতে যাই। হলফ করে বলতে পারি ওই ওয়াইন ছাড়াও আমাদের চলে কিন্তু ব্যারনের বিচিত্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প ছাড়া সন্ধ্যাটা পানসে লাগে।

ব্যারন ভূয়োদর্শী লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা গুলো... অবশ্য ব্যারনের রসালো কথকতার গুণে নোডেল'সের চেয়েও সুস্বাদু হয়ে যায় সেগুলো। ব্রডস্কি বয়সে তরুণ, সে খানিক ত্যান্ডাই ম্যান্ডাই করে ফেলে আর কী।

কদিন ধরেই একঘেয়ে নাছোড় বৃষ্টিটা হয়েই যাচ্ছে। ঘরে বসে বসে হাতপায়ে খিল ধরে গেল... থুড়ি বাত ধরে গেল।

আজ সন্ধ্যাটাও পণ্ড হয়ে যেত হয়তো কিন্তু শেষ বিকেলে বৃষ্টিটা ধরে এল।

চাকরটাকে সাথে নিয়ে এক হাঁটু গদ মাড়াতে মাড়াতে এসে ব্যারনের বাড়ি পৌঁছেছি, আর সেই পরিশ্রমটা কি না হতচ্ছাড়া ব্রডস্কি পণ্ড করে দেবে? বুড়ো শেমলও হাঁ হাঁ করে ব্রডস্কি হতচ্ছাড়াকে থামিয়ে দিল।

বাদানুবাদের ফাঁকে এক আড়চোখে ব্যারনকে দেখে নিলাম, ব্যারন চুপচাপ ফর্কের ডগায় পর্কের টুকরো গেঁথে নির্লিপ্ত মুখে চিবিয়ে যাচ্ছিলেন। বুঝলাম রাগ পড়ে গেছে, এখন মানঅভিমানের নিউট্রাল লাইনে অবস্থান করছেন। আলগোছে কনুইয়েরর খোঁচা দিলাম বুড়ো শেমলকে।

হেঁ হেঁ। সাহেব, গ্রামের লোকজন তো সাহেব, আপনার গল্প গাল হাঁ করে শোনে। এমনকি এই তো সেদিন; কে যেন দক্ষিণের বন থেকে বাঘ বেরোনোর গুজব ছড়িয়েছিল? লোকজন পাত্তাই দিলে না, সবাই বলেছে ব্যারন সাহেবের বাড়ি দক্ষিণে, আর দক্ষিণ দিক দিয়ে কিনা বাঘ আসবে! বাঘের কি প্রাণের মায়া নেই?

আমরা সবাই একযোগে মাথা নাড়ালাম। ব্রডস্কিকে চিমটি কাটায় সেও আমাদের সাথে ঘাড় নাড়ল।

ব্যারন সাহেব এবার যেন একটু নরম হল, চোখে ঝিলিক দিয়ে গেল খুশি।

আমরা আরেকটু গুছিয়ে বসলাম। চোখ বুজে খানিকক্ষণ গড়গড়া টেনে নিয়ে ব্যারন শুরু করলেন।

"হুম তো কী বলছিলাম যেন তখন ওই জলা...

হুম, ওই জলাটা বুঝলে বনের ধারে হওয়ার দরুন বনের পশুপাখিরা তখন ওটাকে নিজেদের এলাকা বলে মনে করত। মাঝে মাঝেই সকালে উঠে দেখতাম বানরের দল ভিড় করেছে, দলছুট দু'চারটে হরিণ মাথা নামিয়ে চুকচুক করে জল খাচ্ছে ইত্যাদি।"

"আর বাঘ!"

"অ্যাঁ... আরে শোনোই না।"

যাক বাঁচা গেল; ব্যারন ব্রডস্কির ছুঁড়ে দেওয়া শ্লেষটা ধরতে পারেননি।

"তো সেদিনও সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে জানালায় দাড়াতেই দেখি, জলাটা ছেয়ে গেছে বুনো হাঁসে। তাদের কিচমিচে কান পাতা দায়।

মুহূর্তেই বুঝলে কিনা আমার শিকারি রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠল। নিজের মধ্যে কেমন যেন উত্তেজনা অনুভব করলুম। হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা পেড়ে নিয়েই ছুট লাগালাম সিঁড়ির দিকে। হুড়মুড়িয়ে নেমেই ব্রেক দিলাম গতিতে, করছি কী... তাড়াহুড়োয় ওরা যদি সতর্ক হয়ে যায় তাহলেই সব গেল।"

"বটেই তো, আপনারা মতো বিচক্ষণ শিকারি..."

"ধুস... এইখানেই তো বাধল বিপত্তি, তাড়াহুড়োয় স্লিপিং গাউনটা পড়ে নেমে এসেছিলাম, সেটাই পায়ে বাধল, হুমড়ি খেয়ে পড়লাম নীচে। মাথায় ভীষণ এক ধাক্কা। ঠিক কপালের মাঝখানে।

চোখের সামনে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক মেরে গেল, তারপর খানিকক্ষণ ধরে শুধু সর্ষেফুল, যেন হাজার আগুনের ফুলকি খেলা করে যাচ্ছে চোখের সামনে। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম সেখানটায় এই এত্তবড় ঢিপি গজিয়ে গেছে..."

"আল্পস বলেনি ভাগ্য ভালো..." ব্রডস্কি মুখ নিচু করে বললেও, ঠিক শুনতে পেলেন ব্যারন।

"কিছু বললে হে ছোকরা..."

"ইশ্! ইশ্! ভাবা যায়... আহারে! খুব লেগেছিল তো..."

"ছোঃ! ওসবে আমার কিছু হয় না... একবার তো মাথাটা... যাকগে যাক সে কথা, ফোলা জায়গাটাও দেখলুম গরম আগুন হয়ে আছে। কিন্তু আমিও ছাড়ার পাত্র নই..."

"সে তো বটেই। এইজন্যেই তো আপনি..."

অন্ধ শিকার

আজকে ঢুকেই দেখলাম, ব্যারনের মুখে বর্ষার পাঁশুটে মেঘ। একাই একাই পান করে চলেছেন সঙ্গে কোনও খাদ্যদ্রব্যাদিও নেই। পাশে ভৃত্যটা তুম্বো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঢুকতে ঢুকতে শুনলাম উদাস স্বরে ব্যারন বলছেন, "বুঝেছ শ্লিভ, সুযোগ বারে বারে আসে না এবং সবার মাথায় তা বর্ষিতও হয় না। তাইতো আজ এতো দারিদ্র... সৌভাগ্যবান তারাই যারা সুযোগের সন্ধান পান। ওসব প্রতিভাটতিভা কিসসু হয় না, সুযোগ ছাড়া ভাগ্য অন্ধ।" বেচারা শ্লিভের বয়স হয়েছে অনেক, পুত্রের বয়সী মালিকের এরূপ দর্শনাঘাত যে তাকে হতচকিত করে দিয়েছে তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলাম।

মিথ্যা বলব না আমরাও বেজায় ঘাবড়ে গেলাম।

বুড়ো ফিসফিস করে বললে, "নেশা হয়েছে মনে হচ্ছে।"

তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে, "মাস্টারের কি আজ শরীরটা খারাপ? আমরা কাল আসব না হয়।"

"কেএ... ও, আপনারা। আসুন আসুন... না না! আমি ঠিক আছি। এই আর কী একটু পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। আপনারা বসুন। 'শ্লিভ, তামাক সেজে আনো ওনাদের জন্য।'"

এইবার চাকর 'শ্লিভ' এর মুখেও রোদ ফুটল, আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ভাবখানা এমন যেন "বাঁচালেন।"

স্বাভাবিক! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরকম দর্শন শুনতে কারই বা ভালো লাগে।

ব্যারন ততক্ষণে গল্প শুরু করে দিয়েছে।

"আপনারা সৌভাগ্যের কথা শুনলেন তো, এইবার কেন বলছিলাম শুনুন। আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। দীর্ঘ শিকারীজীবনে এমন অনেক অযাচিত সুযোগ পেয়েছি যে ভাবলে আজও একই সাথে অবাকও লাগে, আবার গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু দেখুন শিকারীর সৌভাগ্য মানে শিকারের মানে হতভাগ্য পশুগুলোর ক্ষেত্রে তো দুর্ভাগ্য তাই নয় কি?"

ব্রডস্কি এমন জোরে বিষম খেল যে চমকে উঠে আমার মাথা বুড়োর মাথায় ঠুকে গেল। অবশ্য ব্যারনের এহেন হেঁয়ালি আর দর্শন আমাদের মাথা উপর পাথরের টুকরোর মতোই বর্ষিত হচ্ছিল।

শেমলের তো মুখ দেখে মনে হল ব্যাটা এবার একটা হাই তুলবে। তাহলেই কেলেঙ্কারি, আমি তাড়াতাড়ি তার কোঁখে সুড়সুড়ি দিয়ে থামালুম। ওদিকে গাড়ি চলছে তো চলছেই। বেচারা চাকরটি দেখি গড়গড়াগুলো সাজিয়ে দিয়ে ঝিমুতে লেগেছে।

"সুযোগের চেহারা বড় বিচিত্র। নানা ভঙ্গিতে সে আসে। কখনো একক। কখনো বহু। আমি দার্শনিক নই। তাই এসব নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না, বরং একটা উদাহরণ দিই..."

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যেন।

"রাশিয়ার জঙ্গলে আমি একবার অদ্ভুত এক সুযোগের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি বরং সেটার কথাই আপনাদের বলি। এটি আমার শিকারি জীবনের সবচাইতে আশ্চর্যজনক ঘটনা।

সেবার রাশিয়ায় জব্বর শীত পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল। আমি আমার পরিবারের জন্য মাংস জমা করার তালে ছিলাম। সারাদিন বন্দুক হাতে বনে ঘুরে বেড়াতাম, এমন গহীনে যেতাম যে সেখানে কেউ যেতেই সাহস পায় না।

নেকড়ের মুখে লাগাম

ছিল না। রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। এদেশে তো শীতকালে কেউ ঘোড়ার পিঠে বসে না। এমন দুধসাদা বরফের দিনে রীতি হল আয়েশ করে স্লেজে চড়া।

কথায় আছে না, 'যস্মিন দেশে যদাচার', তাই নেমে পড়লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে। স্লেজটা রেডি করলাম। ঘোড়াটাও দেখলুম ফ্যোঁৎ ফ্যোঁৎ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, আমি নেমে যাওয়ায়। বোধহয়, অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে থাকার দরুন মাজায় ব্যথা হয়ে থাকবে। জন্তুজানোয়ারদেরও তো যন্ত্রণাবোধ থাকে। আমরা মানুষজন, তাদের কথা বিবেচনা করি না। যাহোক, ঘোড়া ব্যাটা দেখি বেজায় খুশি। টগবগিয়ে টেনে নিয়ে চলল সেন্ট পিটাসবুর্গের পথে।

কয়েক ক্রোশ পথ যাওয়ার পর, পড়ল এক বিশাল বন।"

"কোন বন?" শুধোল ব্রডস্কি। "আসলে কার্যোপলক্ষ্যে আমাকে মাঝেমাঝে যেতে হয় তো ওদিকে, তাই আর কী..."

"এতদিন পর আমার ঠিক মনে পড়ছে না হে, বনটা ইস্টল্যান্ড বা ইউগোমানল্যান্ড এলাকায় পড়ত বোধহয় সেসময়। তবে স্পষ্ট মনে আছে, খুব ঘন বন ছিল সেটা।

বনজঙ্গলে ঢুকলেই বুঝলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখতে হয়। বিশেষ করে চোখ আর কানকে। না হলে যেকোনো সময়

বিপদ এসে থাবা মারবে।

শীতের বন তো আরও ভয়ংকর। কারণ সেসময় শিকারের অভাব থাকে। একদিকে তীব্র শীত আর অন্যদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধা নেকড়েদের মারাত্মক হিংস্র করে দেয়।

আমি সতর্ক চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ চলছিলাম। মাঝেমাঝে বন্দুকে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। এতকিছু সত্ত্বেও স্লেজের আরামে ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ বুঝলাম ঘোড়াটা থেমে গেছে।

চোখ রগড়ে উঠে বসলাম। এদিক-ওদিক কিচ্ছু নেই, তবে কী! ঘোড়াটা দেখি খালি পিছন ঘুরছে। স্লেজের ওপর দাঁড়িয়ে পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি কী, দূরে ছোট্ট একটা কালো বিন্দু। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে তার আকার অর্থাৎ বিন্দুটা আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। ঘোড়ার ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে বিন্দুটা নির্ঘাত একটা নেকড়ে। নিরীহ পশুরা হিংস্র পশুদের অস্তিত্ব অনেক আগেই বুঝে যায়।

বুকের কাছটা ধক ধক করে উঠল। নেকড়ে আর আমার দূরত্ব প্রতিমুহূর্তে কমে আসছে। যেভাবে আসছে নেকড়েটা, তাতে করে দশ হাত থাকতেই ও সোজা লাফ দেবে, সেক্ষেত্রে আগ্রাসী থাবা থেকে আমার মুক্তির উপায় নেই। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বন্দুক হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলাম।

নেকড়েটার পুরো দেহটা দৃশ্যমান হল এবার। তার ধূসর শরীরটা থিরথির করে কাঁপছে, হলদে চোখদুটোয় চকচক করছে লোভ। স্লেজ থেকে খানিক আগে থেমে গেল প্রাণীটা। আমি এই লক্ষণটা বিলক্ষণ চিনি এবার, ঝাঁপ দেবে প্রাণীটা। দিলও তাই...”

একটু হাঁফ ছেড়ে ব্যারন বললেন, “প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব শিকারীর সবচাইতে বড়ো গুণ। দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে করতে অনুভূতিগুলো ঘষা খেতে খেতে তীক্ষ্ণ ধারালো

হয়ে যায়। এই যে, আমি আমার কথা আপনাদের শোনাতে পারছি, তা ঐ স্বভাবগুণের জন্যেই।

যাক, এ সব বলে সময় নষ্ট করব না। যেটা হল, সেটা হল ঠাণ্ডায় বারুদের সেঁতিয়ে যাওয়া। গুলি তো ধুর, ফুস করে একটু ধোঁয়া বেরিয়ে এল নল দিয়ে।

ভয়ে তখন আমার হাতপা ঠকঠক করে কাঁপছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যু। আজ আর কোনোভাবেই ছাড় পাওয়া যাবে না। এই সময় খেলে গেল মাথাটা, মুহূর্তে স্লেজের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

নেকড়েটার লক্ষ্য ছিলাম আমি। তবে নেকড়েটা বোধহয় ক্ষুধার আতিশয্যে বেশ জোরেই লাফ দিয়েছিল। আমি শুয়ে পড়ায় আমাকে তো বটেই ঘোড়াটাকেও অতিক্রম করে সোজা উড়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল।

বেচারা প্রাণীটা মুখ গুঁজে পড়ে নির্ঘাত চোট পেয়েছিল, তাই আর সহজে উঠতে পারছিল না।

এদিকে নেকড়েটার ভয়টা পিছনে চলে যেতেই, আমার ঘোড়াটা যেন সাহস ফিরে পেল। চিঁহিঁহিঁ... করে লাফ দিয়ে,টান মেরে শুরু করল ছোটা। এমন ধরে টানছে ব্যাটা, যে আমি আর উঠে বসতেই পারছি না, ডালপালা মুখে লাগার ভয়ে শুয়েই রইলাম। ক্ষণে ক্ষণে স্লেজের গতি ত্বরিত হচ্ছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম যে এই যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেছি।

নিশ্চিন্ত অলস মনই কিন্তু যত চিন্তাভাবনার আখড়া। আমারও শুয়ে শুয়ে এবার নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। এতক্ষণে তো আমি শুধু নিজের কথাই ভাবছিলাম। অথচ নেকড়েটা তো ঘোড়ার ওপরও পড়তে পারত, সে কথা একবারও মনে করিনি। অপরাধ বোধ থেকেই একটু কাত হয়ে মাথা উঁচু করলাম।

ওমা! দেখি কী নেকড়েটা নাছোড়বান্দা হয়ে ঘোড়াটাকে ধাওয়া করেছে। আমি কিছু করার আগে ঘোড়ার পেটের নীচের